بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৪ জুন, ২০২২ মোতাবেক ২৪ এহসান, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র যুগের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে (পরিচালিত) বিভিন্ন অভিযানের উল্লেখ করা হচ্ছিল। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সপ্তম যে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, সে সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ অনুযায়ী এটি হযরত খালেদ বিন সাঈদ বিন আ'স (রা.)'র অভিযান ছিল যা মুরতাদ বিদ্রোহীদের দমনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ বিন সাঈদ বিন আ'সের জন্য একটি পতাকা বাঁধেন এবং তাকে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল **হামকাতাইন** অভিমুখে প্রেরণ করেন।

হযরত খালেদ বিন সাঈদ বিন আ'স (রা.)'র আসল নাম খালেদ এবং ডাকনাম ছিল আবু সাঈদ। তার পিতার নাম ছিল **সাঈদ বিন আ'স বিন উমাইয়্যা** এবং **মায়ের নাম লুবাইনা বিনতে হাব্বাব** যিনি উম্মে খালেদ নামে সুপরিচিত ছিলেন। হযরত খালেদ ছিলেন একেবারে প্রাথমিক যুগের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। অনেকের মতে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র পরেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তৃতীয় অথবা চতুর্থ মুসলমান ছিলেন। আবার কারও কারও মতে, তিনি পঞ্চম মুসলমান ছিলেন। তাঁর পূর্বে তখন পর্যন্ত কেবল হযরত আলী বিন আবী তালেব (রা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.), হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত খালেদের ইসলামগ্রহণের ঘটনা হলো– তিনি স্বপ্নে দেখেন, **(তিনি) অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছেন আর তার পিতা তাকে তাতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি দেখেন, মহানবী (সা.) তার কোমর আঁকড়ে ধরে রেখেছেন যাতে তিনি আগুনের মধ্যে পড়ে না যান।** হযরত খালেদ ভয়ে জেগে উঠেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এই স্বপ্ন সত্য। এরপর হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে তার সাক্ষাৎ হলে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে নিজের স্বপ্ন শোনান, তাঁর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমার মঙ্গলের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে রক্ষা করতে চান। ইনি তথা মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল, তাঁর অনুসরণ কর। কেননা, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর অনুসরণ কর তাহলে তিনি তোমাকে আগুনে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করবেন আর তোমার পিতা সেই আগুনে পড়তে যাচ্ছে। অতএব, হযরত খালেদ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) (তখন) মক্কায় **আজইয়াদ** (নামক) স্থানে ছিলেন। **আজইয়াদ** মক্কার **সাফা** পাহাড় সংলগ্ন একটি জায়গার নাম যেখানে মহানবী (সা.) ছাগপাল চরিয়েছিলেন। হযরত খালেদ (রা.) তাঁর (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি মানুষকে কার দিকে আহ্বান করেন? তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করি; যিনি এক-অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোনো শরীক নেই আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। (আমি আরও বলি) তোমরা এসব পাথরের উপাসনা পরিত্যাগ কর, যারা শুনেও না আর দেখেও না আর কারও ক্ষতি বা উপকারও করতে পারে না। এছাড়া তারা জানেও না, কে তাদের

উপাসনা করে আর কে করে না। তখন হযরত খালেদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, **আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল**। হযরত খালেদ (রা.)'র ইসলাম গ্রহণে মহানবী (সা.) খুবই আনন্দিত হন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালেদ (রা.) আত্মগোপন করেন। তার পিতা যখন তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারে তখন সে তার অন্যান্য পুত্র যারা ইসলাম গ্রহণ করে নি তাদেরকে খালেদের সন্ধানে পাঠায়। ফলে তারা তাকে খুঁজে বের করে এবং তাকে ধরে তাদের পিতার কাছে নিয়ে আসে। তাদের পিতা হযরত খালেদ (রা.)-কে গালমন্দ করতে থাকে এবং মারধোর আরম্ভ করে আর হাতের লাঠি দিয়ে তাকে পেটাতে আরম্ভ করে এক পর্যায়ে তার মাথায় আঘাত করতে করতে (লাঠিটি) ভেঙে ফেলে। একই সাথে সে বলতে থাকে, 'তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী হয়েছ, অথচ তুমি তাঁর প্রতি তাঁর জাতির বিরোধিতা দেখতে পাচ্ছ আর সে তাদের উপাস্যদের যে দোষক্রটি বর্ণনা করে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের যে দোষক্রটিও বলে বেড়ায় তাও দেখছ।' হযরত খালেদ উত্তরে বলেন, **'আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তাঁর (সা.) অনুসরণ করাকে শিরোধার্য করেছি!'** এতে তার পিতা চরম রাগান্বিত হয় এবং তাকে বলে, **'হে নির্বোধ! আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও আর যেখানে খুশি চলে যাও। আমি তোমার খাবার বন্ধ করে দিব!'** তখন হযরত খালেদ বলেন, **'আপনি যদি আমার খাবার বন্ধ করে দেন তাহলে আমার জীবিত থাকার জন্য আল্লাহ্ আমাকে রিযক্ দান করবেন।'** অতঃপর তার পিতা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় এবং নিজের (অন্য) ছেলেদের বলে দেয়, তারা কেউই যেন তার সাথে কথা না বলে। অতএব, হযরত খালেদ (রা.) সেখান থেকে বের হন এবং মহানবী (সা.)-এর সাথেই থাকতে আরম্ভ করেন। মোটকথা, তিনি তার পিতার দৃষ্টি এড়িয়ে মক্কার পাশেই (কোথাও) থাকতেন পাছে (তার পিতা) তাকে আবার ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার আরম্ভ করে।

হযরত খালেদের পিতা মুসলমানদের ওপর অনেক বেশি অত্যাচার ও নিপীড়ন করত আর সে মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের একজন ছিল। **একবার সে অসুস্থ হয়ে পড়ে আর রোগের তীব্রতার কারণে সে বলে, 'আল্লাহ্ যদি আমাকে এই রোগ থেকে আরোগ্য দেন;** [জানা নেই সে আল্লাহ্ বলেছিল নাকি নিজের উপাস্যদের নাম নিয়েছিল, যাহোক সে বলেছিল,] **আমি এই রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করলে ইবনে আবী কাবশা, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর খোদার ইবাদত আর মক্কায় হবে না। তখন আমি এমন অত্যাচার চালাব যে, এখান থেকে সব মুসলমানকে বের করে দেব। হযরত খালেদ (রা.) যখন একথা জানতে পারেন তখন তিনি (পিতার বিরুদ্ধে) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তাকে আরোগ্য দিও না। অতএব, সে এই রোগেই মারা যায়।**

মুসলমানরা যখন দ্বিতীয় দফায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন, তখন হযরত খালেদও তাদের সাথে চলে যান; তার সাথে তার স্ত্রী **উমায়মা বিনতে খালেদ খুযাইয়া**ও ছিলেন। হযরত খালেদের আরেক ভাই হযরত আমর বিন সাঈদও তাদের সাথে হিজরত করেছেন। **হযরত খালেদ খায়বারের যুদ্ধের সময়** আবিসিনিয়া থেকে হযরত **জা'ফর বিন আবু তালেবে**র সাথে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। (তিনি) খায়বারের যুদ্ধে অংশ নেন নি, কিন্তু মহানবী (সা.) মালে গণিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তাকেও ভাগ দেন। এরপর উমরাতুল কাযা, মক্কা বিজয়, হুনায়নের যুদ্ধ, তায়েফ ও তাবূকের যুদ্ধসহ সব যুদ্ধেই তিনি মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, এই বঞ্চনার

জন্য তিনি সর্বদা মনস্তাপ করতেন। (তিনি) মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, **'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা (তো) আপনার সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি নি!'** তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, **'তুমি কি এটি পছন্দ করবে না যে, অন্যরা এক হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং তুমি দু'বার হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেছ?'** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) **'দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআনে'** যেসব ওহীলেখকের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে হযরত খালেদ বিন সাঈদ বিন আ'সের নামও রয়েছে।

হযরত খালেদ বিন সাঈদ (রা.)-কে মহানবী (সা.) ইয়েমেনের যাকাত সংগ্রহ করার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর তিরোধান পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বেই (নিয়োজিত) ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর (তিনি) মদীনা চলে আসলে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি ফিরে এলে কেন?' (উত্তরে) তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর পর তিনি অন্য কারও হয়ে কাজ করবেন না। কথিত আছে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করতে বিলম্ব করেছিলেন; কিন্তু বনু হাশেম হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করলে হযরত খালেদও হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করেন। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে বিভিন্ন সময়ে সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। হযরত খালেদ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে **'মারজুস সুফ্‌র'** এর যুদ্ধে শহীদ হন। আবার অনেকের মতে, **'মারজুস সুফ্‌র'** এর যুদ্ধ যেহেতু চতুর্দশ হিজরীতে হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালের প্রারম্ভে আরম্ভ হয়েছিল, (তাই) বলা হয়; হযরত খালেদ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র ইন্তেকালের চব্বিশ দিন পূর্বে সিরিয়ায় **আজনাদীনের** যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তাবারীর ইতিহাসে হযরত খালেদ (রা.)'র মুরতাদদের বিরুদ্ধে অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ এভাবে এসেছে-

হযরত আবু বকর (রা.) যখন **মুরতাদদের দমনের লক্ষ্যে** পতাকা বাঁধেন এবং লোক নির্বাচনের কাজ সমাপ্ত করেন; তখন তাদের মধ্যে **খালেদ বিন সাঈদ (রা.)**ও ছিলেন। হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে, তাকে আমীর নিযুক্ত করতে নিষেধ করেন এবং নিবেদন করেন, আপনি তাকে দিয়ে কোন কাজ করাবেন না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, না। (তিনি) হযরত উমর (রা.)'র সাথে দ্বিমত করেন। আর হযরত খালেদকে **তায়মাতে** সাহায্যকারী বাহিনীতে নিযুক্তি দেন। **তায়মা** সিরিয়া ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি প্রসিদ্ধ শহর। অতএব, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ বিন সাঈদকে তায়মা যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, নিজ স্থান থেকে সরবে না আর চতুর্দিকের লোকদেরকে তোমার দলে যোগ দেওয়ার জন্য আহবান জানাবে। আর কেবল তাদেরকেই দলে নিবে যারা মুরতাদ হয় নি। আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কারও সাথে (আগ বাড়িয়ে) যুদ্ধ করবে না, তবে তারা ব্যতীত যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। হযরত খালেদ (রা.) তায়মাতে অবস্থান করেন এবং চারদিকের বিভিন্ন দল তার সাথে এসে মিলিত হয়। মুসলমানদের এই মহান সৈন্যবাহিনীর সংবাদ রোমানরা পাওয়ার পর তারা তাদের অধীনস্থ আরবদের কাছে সিরিয়ার যুদ্ধের জন্য সৈন্য চেয়ে পাঠায়। হযরত খালেদ (রা.) রোমানদের প্রস্তুতি ও আরব গোত্রগুলোর আগমন সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.)-কে অবহিত করেন। হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে লিখেন, তোমরা অগ্রসর হও, বিন্দুমাত্র ভীত হবে না, আর আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর। এই উত্তর পাওয়া মাত্রই হযরত খালেদ (রা.) শত্রুদের অভিমুখে অগ্রসর হন আর যখন শত্রুসৈন্যের কাছে পৌঁছেন তখন শত্রুদের মধ্যে এমন ত্রাস সঞ্চারিত হয় যে, সবাই নিজ জায়গা পরিত্যাগ

করে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। হযরত খালেদ (রা.) শক্রুঘাঁটি দখল করে নেন। হযরত খালেদের কাছে যারা একত্র হয়েছিল তাদের অধিকাংশ মুসলমান হয়ে যায়। এই সফলতার খবর হযরত খালেদ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) জবাবে লিখেন, তুমি সম্মুখে অগ্রসর হও তবে এতটা অগ্রসর হয়ো না পাছে পিছনে শক্রু আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে যায়।

ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে মুরতাদদের বিরুদ্ধে হযরত খালেদ বিন সাঈদ (রা.)'র কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কেবল এতটুকুই জানা যায়। এছাড়া হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফাতকালে সিরিয়ার বিজয়াভিযানের বিভিন্ন ঘটনাতেও তাঁর যে ভুমিকা রয়েছে তা আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অষ্টম যুদ্ধাভিযানটি ছিল হযরত তুরায়ফা বিন হাজেযের পক্ষ থেকে। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত তুরায়ফা বিন হাজেযের জন্য একটি পতাকা বাঁধেন এবং তাকে **বনু সুলায়েম** এবং **বনু হাওয়াযেনের** মোকাবিলা করার নির্দেশ প্রদান করেন। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রা.) বনু সুলায়েম ও বনু হাওয়াযেন গোত্রের মোকাবিলার জন্য **মা'আন বিন হাজেয**কে প্রেরণ করেছিলেন। যাহোক, **আল্লামা ইবনে আব্দুল বার** তাঁর আল্ ইস্তিয়াব পুস্তকে হযরত তুরায়ফা এবং হযরত মা'আনের পিতার নাম হাজেয, অর্থাৎ 'যা' দিয়ে এবং আল্লামা ইবনে আসীর উসদুল গাবা পুস্তকে হাযের, অর্থাৎ 'রা' দিয়ে লিখেছেন। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত তুরায়ফা বিন হাজেযকে (বনু) সুলায়েমের এসব আরবের গভর্নর নিযুক্ত করেন যারা ইসলাম ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান ও উদ্যমী কর্মী ছিলেন। তিনি এমন প্রভাব বিস্তারী বক্তৃতা করেন যে, বনু সুলায়েমের অনেক আরব তাঁর সাথে যুক্ত হয়ে যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর (রা.) বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, বনু সুলায়েমের অবস্থা এমন ছিল যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর তাদের অনেকেই মুরতাদ হয়ে যায় এবং কুফরের দিকে ফিরে যায় আর তাদের কিছু লোক স্বীয় গোত্রের আমীর মা'আন বিন হাজেয অথবা কারও কারও মতে তার ভাই তুরায়ফা বিন হাজেযের সাথে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যখন তুলায়হার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হন তখন হযরত আবু বকর (রা.) মা'আনকে লিখেন, বনু সুলায়েম গোত্রের যারা ইসলামের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত তাদেরকে নিয়ে হযরত খালিদ (রা.)'র সাথে যাও। হযরত মা'আন (রা.) নিজ স্থানে তার ভাই তুরায়ফা বিন হাজেযকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে হযরত খালেদ (রা.)'র সাথে বেরিয়ে পড়েন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবী বকর (রা.)'র পক্ষ থেকেই আরও একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে আর সেটি হলো– বনু সুলায়েম গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.)'র সকাশে উপস্থিত হয়, তাকে **ফুজা'আ** বলা হত। আসলে তার নাম ছিল, **আইয়্যায বিন আব্দুল্লাহ্**। ফুজা'আ শব্দে আকস্মিকতার অর্থ পাওয়া যায়, কেননা এই ব্যক্তি পথচারী ও গ্রামবাসীদের ওপর অতর্কিতে হানা দিয়ে তাদের (ধনসম্পদ) লুট করে নিত, এজন্য তার ফুজা'আ নামটি প্রসিদ্ধি পায়। যাহোক, সে হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে উপস্থিত হয়ে বলে, আমি একজন মুসলমান আর আমি সেসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই যারা ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। তাই আপনি আমাকে বাহন দিন এবং সাহায্য করুন। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে বাহন দেন এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করেন। এক স্থানে এর

বিস্তারিত বিবরণ এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.) তাকে দু'টি ঘোড়া অথবা অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুসারে ত্রিশটি উট এবং ত্রিশজন সৈন্যের অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করেন, এছাড়া দশজন সশস্ত্র মুসলমানকে তার সাথে প্রেরণ করেন। এই ব্যক্তি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং পথিমধ্যে যে মুসলমান বা মুরতাদই তার সামনে আসত তাদের ধনসম্পদ সে ছিনিয়ে নিত আর যে ব্যক্তি (সম্পদ দিতে) অস্বীকৃতি জানাত তাকে সে হত্যা করত। সবার সাথে সে একই আচরণ করছিল, মুসলমানদেরকেও হত্যা করত, শহীদ করে দিত। তার সাথে বনু শরীদ গোত্রের এক ব্যক্তিও ছিল, তাকে **নাযেবা বিন আবু মায়সা** নামে ডাকা হত।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, ফুজা'আ তার গোত্রের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে থাকে এবং পথে সে মুরতাদ আরবদেরকে তার সাথে যুক্ত করতে থাকে। এভাবে তার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গেলে প্রথমে সে তার মুসলমান সঙ্গীদের হত্যা করে এবং তাদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়। এরপর সে নির্বিচারে লুটতরাজ চালাতে থাকে। কখনো এই গোত্রে আবার কখনো সেই গোত্রে অতর্কিতে আক্রমন করত। মুসলমানদের একটি দল মদীনায় যাচ্ছিল, সে তাদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয় এবং তাদের হত্যা করে। প্রথমে (মালামাল) ছিনিয়ে নেয় আর পরে হত্যা করে এবং শহীদ করে দেয়। হযরত আবু বকর (রা.) এ বিষয়টি অবগত হওয়ার পর হযরত **তুরায়ফা বিন হাজেয** (রা.)-কে লিখেন কিংবা কারও কারও মতে হযরত আবু বকর (রা.) এ নির্দেশটি মূলত মা'আনকে দিয়েছিলেন আর তিনি তার ভাই তুরায়ফাকে পাঠিয়েছিলেন। যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.) লিখেন, আল্লাহ্‌র শত্রু ফুজা'আ আমার কাছে এসে বলেছিল, সে নাকি মুসলমান। সে আমার কাছে দাবি করে, ইসলাম পরিত্যাগকারী মুরতাদদের বিরুদ্ধে আমি যেন তাকে (যুদ্ধের জন্য) শক্তির যোগান দেই। তাই আমি তাকে বাহন ও অস্ত্রশস্ত্র দেই। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিতভাবে জেনে গেছি যে, এই আল্লাহ্‌র শত্রু মুসলমান এবং মুরতাদদের নিকট গিয়ে তাদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয় আর যে-ই তার বিরোধিতা করেছে তাকে সে হত্যা করেছে। অতএব, তোমার সাথী মুসলমানদের তুমি সাথে নিয়ে যাও এবং তাকে হত্যা কর অথবা গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত তুরায়ফা (রা.)'র সাহায্যের জন্য হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস (রা.)-কেও প্রেরণ করেন। হযরত তুরায়ফা বিন হাজেয (রা.) তার সাথে যুদ্ধ করতে যান। এই দু'টি দল যখন পরস্পরের মুখোমুখি হয় তখন প্রথমে শুধু তির বিনিময় হয়। একটি তির **নাজওয়া বিন আবু মায়সার** গায়ে বিদ্ধ হয়, ফলে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। মুসলমানদের বীরত্ব ও দৃঢ়তা দেখার পর ফুজা'আ হযরত তুরায়ফা (রা.)-কে বলে, একাজ করার অধিকার আমার চেয়ে তোমার বেশি নয়। তুমিও হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত আমীর আর আমিও তাঁর নিযুক্ত আমীর। সে তাঁকে অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। হযরত তুরায়ফা (রা.) তাকে বলেন, সত্যবাদী হয়ে থাকলে অস্ত্র সমর্পণ কর। তোমাকে গ্রেফতারের জন্য হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে প্রেরণ করেছেন। কাজেই, অস্ত্র সমর্পণ কর এবং আমার সাথে হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট চল। সেখানেই সমাধা হয়ে যাবে তুমি আমীর কিনা? অতএব, ফুজা'আ হযরত তুরায়ফা (রা.)'র সাথে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে আর তারা দু'জনই হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে উপস্থিত হলে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত তুরায়ফা (রা.)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, তাকে **বাকী**'তে নিয়ে গিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেল। তার সাথে এই আচরণ করার কারণ হলো– মুসলমানদের সাথেও সে একই আচরণ করত। হযরত তুরায়ফা তাকে সেখানে নিয়ে যান

এবং আগুন জ্বালিয়ে তাকে তাতে নিক্ষেপ করেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, যুদ্ধ চলাকালে ফুজা'আ পালিয়ে গেলে হযরত তুরায়ফা তার পিছু ধাওয়া করে তাকে বন্দী করেন এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে এলে তিনি (রা.) তার জন্য মদীনায় বড় পরিসরে আগুন জ্বালিয়ে তার হাত পা বেঁধে তাকে তাকে নিক্ষেপ করেন।

নবম অভিযানটি ছিল হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)'র যা বিদ্রোহী মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) একটি পতাকা হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)-কে প্রদান করেন এবং তাকে বাহরাইনে যাওয়ার নির্দেশ দেন। বাহরাইন, ইয়ামামা এবং পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এতে বর্তমান কাতার এবং বাহরাইনের এমারতের শাসনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি বর্তমানের ছোট বাহরাইন নয়, বরং এটি সে সময় বিস্তৃত অঞ্চল ছিল। এর রাজধানী ছিল **দারীন**। মহানবী (সা.)-এর যুগে **মুনযের বিন সাওয়া** এখানকার শাসক ছিলেন, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সে যুগে বাহরাইন বা সৌদি আরবকে **আল আসা** বলা হতো।

হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)'র পরিচয় নিম্নরূপ: তাঁর নাম ছিল আলা এবং তার পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তিনি ইয়েমেনের **হাযার মওতের** অধিবাসী ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগেই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)'র এক ভাই আমর বিন হাযরামী ছিল মুশরিকদের প্রথম ব্যক্তি যাকে এক মুসলমান হত্যা করেছিল এবং তার সম্পদই সর্বপ্রথম **খুমুস** হিসেবে ইসলামের হাতে আসে। বদরের যুদ্ধের মৌলিক এবং তাৎক্ষণিক কারণসমূহের মাঝে এই হত্যাকেও একটি কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)'র এক ভাই আমের বিন হাযরামী বদরের দিন অবিশ্বাসের মাঝে মারা পড়ে। মহানবী (সা.) যখন রাজা-বাদশাহ্দের প্রতি তবলীগি পত্র প্রেরণ করেন তখন বাহরাইনের শাসক মুনযের বিন সাওয়ার নিকট পত্র নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)'র ওপর ন্যস্ত হয়। এরপর মহানবী (সা.) তাঁকে বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেন। হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মুনযের যখন ইসলামের দাওয়াত পান তখন তার প্রতিক্রিয়া এরূপ ছিল যে, আমি এ বিষয়ে অনেক ভেবেচিন্তে দেখেছি, আমার হাতে যা আছে তা এ দুনিয়ার জন্য, পরকালের জন্য নয়। অর্থাৎ, আমার কাছে যা কিছুই আছে তা জাগতিকতা আর পারলৌকিক কোন প্রস্তুতি আমার নেই। কিন্তু আমি যখন তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলাম তখন এটিকে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের জন্য কল্যাণজনক পেয়েছি। অতএব, ধর্ম গ্রহণে আমাকে কোন কিছুই বাধা দিতে পারবে না। ইসলামের সত্যতা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এতে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে রয়েছে জীবনের আশা-ভরসা এবং মৃত্যুর প্রশান্তি। তিনি বলেন, কাল পর্যন্ত আমি তাদের সম্পর্কে আশ্চর্য হতাম যারা একে গ্রহণ করত, কিন্তু আজ আমি তাদের দেখে আশ্চর্য হচ্ছি যারা একে প্রত্যাখ্যান করে। এই শিক্ষার সৌন্দর্য সম্পর্কে জানার পর এখন আমার চাওয়া-পাওয়া বদলে গিয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আনীত শরীয়তের মাহাত্ম্যের দাবি হলো– মহানবী (সা.)-কে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.) বাহরাইনের গভর্নর ছিলেন। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালেও

তিনি সেই পদেই অধিষ্ঠিত থাকেন এবং হযরত উমর (রা.)ও তাঁর খিলাফতকালে আমৃত্যু তাকে এ দায়িত্বেই বহাল রাখেন ।

তাবকাত ইবনে সা'দের বর্ণনা অনুসারে বাহরাইনের অধিবাসীরা একবার হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)'র বিরুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর নিকট অভিযোগ করলে মহানবী (সা.) তাকে অপসারণ করেন এবং হযরত আবান বিন সাঈদ বিন আ'স (রা.)-কে গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর সেখানে যখন ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করে তখন **হযরত আবান** মদীনায় ফেরত চলে আসেন এবং পদত্যাগ করেন। আর হযরত আবু বকর (রা.) তাকে পুনরায় বাহরাইন পাঠাতে চাইলে তিনি এই বলে অপারগতা প্রকাশ করেন যে, মহানবী (সা.)-এর পর আমি এখন আর অন্য কারও কর্মকর্তা হব না। এতে হযরত আবু বকর (রা.) পুনরায় **হযরত আলা বিন হাযরামীকে** বাহরাইনের কর্মকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন; যাতে তিনি আমৃত্যু বহাল ছিলেন।

হযরত আলা (রা.) এমন (পুণ্যবান হিসেবে) খ্যাতি রাখতেন যার দোয়া গৃহীত হতো। তার ব্যাপারে এ সংক্রান্ত অনেক রেওয়াত বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বলতেন, তার গুণাবলী ও দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়টি আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছে। তিনি রেওয়ায়েতে অন্য অনেক বিষয়ের পাশাপাশি এটিও বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি মদীনা থেকে বাহরাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে পানি শেষ হয়ে যায়। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করেন আর দেখতে পান যে, বালুর নীচ থেকে একটি ঝর্ণা প্রস্ফূটিত হয়েছে এবং আমরা সবাই পরিতৃপ্ত হই।

অতঃপর **হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি আলা'র সাথে বাহরাইন থেকে সেনাবাহিনী সহ বসরা অভিমুখে রওয়ানা হই। আমরা লিয়াস নামক স্থানে ছিলাম এমন সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। লিয়াস বনু তামীম-এর এলাকাস্থ একটি গ্রামের নাম। আমরা এমন স্থানে ছিলাম যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য এক খণ্ড মেঘ দৃশ্যমান করেন বা নিয়ে আসেন যা আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করে। আমরা তাকে গোসল দেই আর নিজেদের তরবারি দিয়ে তার জন্য কবর খনন করি। আমরা তার জন্য লাহাদ বানাইনি। আমরা লাহাদ বানানোর উদ্দেশ্যে ফিরে আসি,** অর্থাৎ, স্বল্পকাল পরে ফেরত গিয়ে দেখি; **কিন্তু তার কবরের স্থান আর খুঁজে পাই নি**।

তার মৃত্যুর ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। কারও কারও মতে তার মৃত্যু চৌদ্দ হিজরীতে হয়েছিল, আবার কারও কারও মতে একুশ হিজরীতে হয়েছিল।

বাহরাইনের পরিস্থিতির ব্যাপারে উল্লিখিত আছে যে, বাহরাইন হীরার বাদশাহ্‌দের অধীনে ছিল। হীরার বাদশাহ্‌রা ইরানের বাদশাহ্‌দের অধীনে ছিল। হীরা ইসলামের পূর্বে ইরাকের বাদশাহ্‌দের শাসনকেন্দ্র ছিল। বাহরাইনের সমুদ্র তীরবর্তী ও বাণিজ্যিক শহরগুলোতে মিশ্র জনবসতি ছিল। সেখানে পারসী, খ্রিস্টান, ইহুদী ও জাটরাও ছিল। আরবের ব্যবসার ওপর পারসীয়ানদের প্রাধান্য ছিল। এসব এলাকায় ব্যবসায়ীদের একটি দলেরও বসতি ছিল যারা ভারত এবং ইরান থেকে এসেছিল আর ফুরাত নদীর উৎপত্তিস্থল (বা মুখ থেকে) আদান এর উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। এই ব্যবসায়ীরা এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করেছিল। আর তাদের মাধ্যমে যেসব বংশধর জন্ম নিয়েছিল তাদেরকে **'আবনা'** নামে ডাকা হতো। তীরবর্তী শহরগুলোর পেছনে তিনটি বড় গোত্র আর তাদের অনেকগুলো শাখার বসতি ছিল। একটি

হলো, **বকর বিন ওয়ায়েল**, দ্বিতীয় **আব্দুল কায়েস** এবং তৃতীয়টি ছিল **রবীআ**। তাদের অনেক বংশ ছিল খ্রিস্টান। ঘোড়া, উট এবং ছাগল পালন এবং খেজুরের বাগান করা তাদের প্রধান পেশা ছিল। এসব গোত্রের ব্যবস্থাপক সেসব স্থানীয় নেতা হতো যারা **হীরা** সরকারের আস্থাভাজন হতো। তাদের মাঝে একজন ছিল **মুনযের বিন সাবা**, যে বাহরাইনের **হাযার** জেলায় বসবাস করতো এবং হাযার এর আশেপাশে আব্দুল কায়েস গোত্রের ওপর তার রাজত্ব ছিল। আব্দুল কায়েস গোত্রের দু'টি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়। একটি প্রতিনিধিদল পঞ্চম হিজরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়েছিল, যাতে তেরো বা চৌদ্দজন সদস্য ছিল। আর আব্দুল কায়েস গোত্রের দ্বিতীয় প্রতিনিধিদল **'আমুল উফুদ'** অর্থাৎ, নবম হিজরীতে দ্বিতীয়বার মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়েছিল, যেটিতে জারূতসহ চল্লিশজন সদস্য ছিল। জারূত খ্রিস্টান ছিল, যে এখানে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। একটি উক্তি অনুসারে উক্ত প্রতিনিধিদল মহানবী (সা.)-এর কাছে আসার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। হাযার এর পারসীয়ান, খ্রিস্টান এবং ইহুদীরা নিতান্ত অনিচ্ছায় জিযিয়া বা কর দিতে সম্মত হয়েছিল। বাহরাইনের অন্যান্য বসতি এবং শহরগুলো অমুসলিম রয়ে যায়, কিন্তু তারা যখনই সুযোগ পেতো বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহ করতো। মুনযের বিন সাবার ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা.) তাকে রীতিমতো বাহরাইনের গভর্নর হিসেবেই নিযুক্ত রাখেন। ইসলামগ্রহণের পর তিনি তার জাতিকেও সত্য ধর্মের তবলীগ করতে আরম্ভ করেন এবং **জারূত বিন মুয়াল্লাকে** ধর্মীয় শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-এর সমীপে প্রেরণ করেন। জারূত মদীনা পৌঁছে ইসলামী শিক্ষামালা এবং আদেশনিষেধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন এবং স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে মানুষের মাঝে সত্য ধর্মের প্রচার এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার কাজ আরম্ভ করেন। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের কয়েক দিন পর, অর্থাৎ **১১** হিজরী সনে, মুনযেরও মৃত্যুবরণ করেন। এতে আরব এবং অনারব সবাই বিদ্রোহ করে বসে। আব্দুল কায়েস গোত্র বলে, যদি মুহাম্মদ (সা.) নবী হতেন তাহলে তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করতেন না আর সবাই মুরতাদ হয়ে যায়। হযরত জারূত এই সংবাদ পান। হযরত জারূত তার গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন, যিনি শিক্ষাদীক্ষার উদ্দেশ্যে মদীনায় গিয়েছিলেন, আর তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা মহানবী (সা.)-এর কাছে হিজরত করেছিলেন এবং একজন সুবক্তা ছিলেন। মহানবী (সা.) কেন মৃত্যুবরণ করবেন এ অজুহাতে যারা যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তাদের সবাইকে হযরত জারূত একত্রিত করেন আর বক্তৃতা করার জন্য দাঁড়ান এবং বলেন, হে আব্দুল কায়েস গোত্র! আমি তোমাদেরকে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করছি, যদি তোমাদের এর উত্তর জানা থাকে তাহলে আমাকে বলবে। আর যদি তোমাদের তা না জানা থাকে তাহলে বলার প্রয়োজন নেই। তারা বলল, যা ইচ্ছা প্রশ্ন কর। **হযরত জারূত বলেন, তোমরা কি জানো অতীতেও আল্লাহ্ তা'লার নবীগণ পৃথিবীতে এসেছেন? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। হযরত জারূত বলেন, তোমরা কি কেবল জানো নাকি তোমরা তাদের দেখেছ? তারা উত্তরে বলল, না! আমরা তাদের দেখি নি, আমরা কেবল তাদের সম্পর্কে জানি। হযরত জারূত (রা.) বলেন, তাহলে তারা কোথায় গিয়েছে? তখন লোকেরা বলল, তারা মৃত্যু বরণ করেছেন। তখন হযরত জারূত (রা.) বলেন, অনুরূপভাবে মুহাম্মদ (সা.)'ও মৃত্যু বরণ করেছেন যেভাবে তারা সবাই মৃত্যু বরণ করেছেন।** আর আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে, **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু**। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। তার

এই বক্তৃতা শুনে ও প্রশ্নোত্তরের পর তার জাতি বলে, আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর নিশ্চয় মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। আর আমরা তোমাকে আমাদের মাঝে সম্মানিত এবং আমাদের নেতা হিসেবে মান্য করছি। এভাবে তারা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং ধর্মত্যাগের মহামারি তাদের আক্রান্ত করে নি। বাকি আরব এবং অনারব সবাই মদীনার কর্তৃত্ব নস্যাৎ করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছিল। পারস্য সাম্রাজ্য তাদেরকে প্ররোচিত করে এবং বিদ্রোহের নেতৃত্ব একজন বড় আরব নেতার হাতে অর্পণ করে। হাযর-এ মহানবী (সা.)-এর প্রতিনিধি আবান বিন সাঈদ বিন আস বিদ্রোহের কালো মেঘ দেখে মদীনায় চলে আসেন। বনু আব্দুল কায়েস গোত্রের কিছু মানুষ যদিও বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু বাহরাইন এর অন্যান্য গোত্র হুতুম বিন যুবায়া-র নেতৃত্বে যথারীতি মুরতাদ থেকে যায়। আর তারা রাজত্বকে পুনরায় মুনযের-এর বংশে এনে মুনযের বিন নোমানকে নিজেদের বাদশাহ্ বানিয়ে নেয়। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা যখন মুনযের বিন নোমানকে বাদশাহ্ বানানোর সিদ্ধান্ত নেয় তখন তাদের গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয়রা ইরানের বাদশাহ্ কিসরার কাছে যায়। তারা তার সামনে উপস্থিত হওয়ার আবেদন করে। কিসরা তাদের অনুমতি দিলে তারা বাদশাহ্দের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে তার সামনে উপস্থিত হয়। কিসরা বলে, হে আরবের গোত্র! কী কারণে তোমরা এখানে এসেছ? তারা বলল, হে বাদশাহ্! আরবের সেই ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করেছে যাকে কুরাইশ এবং মুনযের সম্প্রদায়ের সকল গোত্র সম্মানিত মনে করতো। তাদের এ কথায় তারা মহানবী (সা.)-কে বুঝিয়েছিল। এরপর তারা বলে, আর তাঁর পর এক ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন যিনি শীর্ণকায় ও দুর্বল চিন্তার অধিকারী। অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে এই মতামত ব্যক্ত করে। আর তার গভর্নররা নিজেদের সাথীর কাছে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে ফিরে গিয়েছে। আজ বাহরাইনের এলাকা তাদের হস্তচ্যুত। আব্দুল কায়েস এর ছোট একটি দল ছাড়া আর কেউ ইসলাম ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নেই। আমাদের কাছে তাদের কোন গুরুত্ব নেই এবং অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর দিক থেকে তাদের চেয়ে আমাদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। আপনি এমন কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন যে বাহরাইন করায়ত্ব করতে চাইলে কেউ যেন তাকে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে। তখন কিসরা তাদেরকে বলে, তোমরা কাকে পছন্দ কর যাকে আমি তোমাদের সাথে বাহরাইন প্রেরণ করতে পারি? তারা বলল, বাদশাহ্ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারেন। কিসরা বলে, মুনযের বিন নোমান বিন মুনযের-এর ব্যপারে তোমাদের মতামত কী? তারা বলল, হে বাদশাহ্! আমরা তাকেই পছন্দ করি এবং আমরা তাকে ছাড়া আর কাউকে চাই না। এরপর কিসরা মুনযের বিন নোমানকে ডেকে পাঠায়। সে সদ্য যৌবনে পা রেখেছে যার কেবল নতুন দাঁড়ি গজিয়েছিল। বাদশাহ্ তাকে শাহী পোশাক দান করে এবং মুকুট পরিধান করায় আর একশ অশ্বারোহী দান করে ও আরো সাত হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে তাকে বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের সাথে বাহরাইন যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করে এবং তার সাথে আবু যুবায়া হুতুম বিন যায়েদকে পাঠায়, যার নাম ছিল শুরাইহ বিন যুবায়া। সে বনু কায়েস বিন সালাবার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং হুতুম তার উপাধি ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া যাবিয়ান বিন আমর এবং মুসমি বিন মালিকও ছিল। সর্বপ্রথম তারা হযরত জারূত এবং আব্দুল কায়েস গোত্রকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। এই প্রেক্ষিতে হুতুম বিন যুবায়া বল প্রয়োগ করে তাদেরকে পদানত করার চেষ্টা করে। সে কাতীফ এবং হাযর- এ

বসবাসরত বিদেশী ব্যবসায়ীদের ও সেমব লোক যারা ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদেরকে নিজের সাথে মিলিয়ে নেয়। আব্দুল কায়েস গোত্রের চার হাজার লোক নিজেদের নেতা হযরত জারূত বিন মুআল্লা (রা.)'র নিকট তাদের মিত্র ও দাসসহ সমবেত হয়। আর বকর বিন ওয়ায়েল গোত্র তাদের নয় হাজার ইরানী এবং তিন হাজার আরবসহ তাদের নিকটবর্তী হয়। অতঃপর দুই পক্ষের মাঝে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় এবং বকর বিন ওয়ায়েল গোত্র ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখিন হয়। তাদের এবং ইরানীদের মধ্য থেকে বহু সংখ্যক (লোক) নিহত হয়। পুনরায় তারা দ্বিতীয়বার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে। এবার আব্দুল কায়েস গোত্রের অনেক ক্ষতি হয়। এভাবে তারা একে অপরের থেকে প্রতিশোধ নিতে থাকে এবং তাদের মাঝে অনেক দিন ধরে এই যুদ্ধ চলমান থাকে। এমনকি অনেক মানুষ নিহত হয় এবং আব্দুল কায়েস গোত্রের সাধারণ মানুষেরা বকর বিন ওয়ায়েলের কাছে শান্তি প্রস্তাব দেয়। সেই সময় আব্দুল কায়েস বুঝতে পারে যে, এখন বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার শক্তি তাদের নেই। অতএব, তারা পরাজয় বরণ করে এমনকি তারা হাযরে জুওয়াসা নামক দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে যায়। জুওয়াসা বাহরাইনের সেই বসতি যেখানে মহানবী (সা.)-এর মসজিদের পর সর্বপ্রথম জুমুআ'র নামায আদায় করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, তিনি (রা.) বর্ণনা করেন,

إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فِي مَسْجِدِ عبدِ القَيْسِ بجُواثَى مِنَ البَحْرَيْنِ

অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর মসজিদের পর সর্বপ্রথম জুমুআ বাহরাইনে জুওয়াসা নামক স্থানে আব্দুল কায়েস গোত্রের মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। বনু বকর বিন ওয়ায়েল গোত্র তাদের ইরানী মিত্রদের সাথে নিয়ে অগ্রসর হয়ে তাদের দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং দুর্গে রসদপত্র যাওয়া বন্ধ করে দেয়। বনু বকর বিন কিলাবের এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্ বিন অওফ আবদি, যার নাম আব্দুল্লাহ্ বিন হাযাফ-ও উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি এই পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর (রা.) এবং মদীনাবাসীকে উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা শোনান যাতে তিনি নিজেদের অসহায়ত্ব, নিরূপায় অবস্থা আর দৃঢ় মনোবল এবং ধৈর্য্যেরও বহিঃপ্রকাশ করেন। এটি যেহেতু কিছুটা দীর্ঘ কবিতা তাই এর অনুবাদ হলো: **"হে শ্রোতারা! হযরত আবু বকর এবং মদীনার সকল যুবককে এই বাণী পৌঁছে দাও, সে সকল যুবক, জুয়াসাতে ক্ষুধা ও অবরোধের মাঝে যাদের ওপর সন্ধ্যা নেমে এসেছে, তাদের জন্য আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য লাভ হবে কি? সব রাস্তা তাদের রক্তে এমন রঞ্জিত যেন সূর্যের কিরণ দর্শকের চোখকে অন্ধ করে দিচ্ছে। বনু যোহলো আর ইজল আর শায়বান আর কায়েস গোত্রগুলো অন্যায়ভাবে তাদের সবাইকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে 'গরুর' যেন অন্যায়ভাবে তারা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে ছিনিয়ে নিতে পারে। গরুরের প্রকৃত নাম ছিল মুনযের বিন নো'মান বিন মুনযের। তাদের অবরোধ কঠোর ও দীর্ঘায়িত হতে হতে একপর্যায়ে তারা আমাদের ওপর বিজয় লাভ করে, আর এ কারণে আমরা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছি। আমরা রহমান খোদার প্রতি ভরসা করেছি, কেননা আমরা দেখেছি, তাঁর প্রতি ভরসাকারীরা তাঁর কৃপা লাভ করে। তাই আমরা বললাম, আমরা এ নিয়ে সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রভু। আর এ কথায়ও আমরা সন্তুষ্ট যে, ইসলাম আমাদের ধর্ম। আর আমরা বললাম, সমস্যার একদিন সমাধান হয়েই যায়, আমাদের পিতৃপুরুষের**

সন্তানদের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আমরা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকব; এতে হয় আমরা ধ্বংস হবো, না হয় আমরা শাহাদত বরণ করবো। আমাদের প্রত্যেকে সেই তীক্ষ্ম ধারালো ভারতীয় তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করবে যা নিমিষেই কর্তনকারী আর যা শিরস্ত্রাণ ও বর্মকে কেটে ফেলে।"

তিনি কবিতার আকারে এ বাণী লিখে মদীনায় প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) এই কবিতা পাঠ করে আব্দুল কায়েসের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হয়ে ভীষণ দুঃখ পান। তিনি হযরত আলা বিন হাযরামী'কে ডেকে পাঠান এবং সৈন্যদলের নেতৃত্ব তার হাতে অর্পণ করেন আর দু'হাজার মুহাজির ও আনসারসহ বাহরাইন অভিমুখে আব্দুল কায়েসের সাহায্যার্থে যাত্রা করার আদেশ দেন আর নির্দেশনা প্রদান করেন যে, আরব গোত্রগুলো থেকে যে গোত্রের পাশ দিয়েই তোমরা অতিক্রম করবে তাদেরকে বনু বকর বিন ওয়ায়েলের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করবে, কেননা সে ইরানের বাদশাহ্ কিসরার মনোনীত মুনযের বিন নোমান বিন মুনযেরের সাথে এসেছে। সে তথা সেই বাদশাহ্ তার মাথায় রাজকীয় মুকুট পরিধান করিয়েছে আর আল্লাহ্র জ্যোতিকে মিটিয়ে দেয়ার সংকল্প করেছে এবং আল্লাহ্র ওলীদেরকে হত্যা করেছে। তাই তোমরা **'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্'** তথা আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া পাপ থেকে রক্ষা লাভের কোনো শক্তি নেই আর পুণ্য করারও শক্তি নেই– দোয়া পড়ে যাত্রা কর। হযরত আলা বিন হাযরামী যাত্রা করেন। তিনি যখন ইয়ামামার পাশ দিয়ে যান তখন হযরত সুমামা বিন উসাল বিন হানীফা একটি দল নিয়ে তার সাথে যুক্ত হন। হযরত উসামা তাদের সাথে এসে যোগ দেন। এছাড়া কায়েস বিন আসেমও নিজ গোত্র বনু তামীমের সাথে হযরত আলা বিন হাযরামীর সৈন্যদলের সাথে যুক্ত হয়। ইতিপূর্বে কায়েস বিন আসেম যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি প্রদানকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর তিনি নিজ গোত্রের যাকাত মদীনায় প্রেরণ করা একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অধিকন্তু যাকাতের সংগৃহীত সমস্ত সম্পদ লোকদের ফেরত দিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যখন ইয়ামামায় বনু হানীফাকে পরাভূত করেন তখন কায়েস বিন আসেম মুসলমানদের সামনে মাথা নত করার মাঝেই নিজেদের নিরাপত্তা নিহিত বলে মনে করেন এবং নিজ গোত্র বনু তামীমের নিকট হতে যাকাত আদায় করেন এবং হযরত আলা বিন হাযরামীর সৈন্যদলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। হযরত আলা নিজ সেনাদল নিয়ে দাহ্নার পথে বাহরাইনের দিকে অগ্রসর হন। দাহ্নাও বসরা থেকে মক্কা অভিমুখে বনু তামীমের এলাকার একটি স্থানের নাম। তিনি বলেন, আমরা যখন এর মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত হই, তখন তিনি আমাদেরকে সেখানে যাত্রা বিরতির নির্দেশ দেন (বর্ণনাকারী বলছেন)। রাতের আঁধারে উটগুলো অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পালিয়ে যায়। তাদের কারো কাছে না কোন উট থাকল, না পাথেয় বা পাথেয় রাখার পাত্র আর না তাঁবু। সবকিছু উটের সাথে মরুভূমিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ, উটের পিঠে চাপানো ছিল, উট যেহেতু পালিয়ে যায় তাই তাদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। আর এ ঘটনা তখন ঘটেছে যখন লোকেরা বাহন থেকে অবতরণ করেছিল, কিন্তু তখনও নিজেদের সরঞ্জামাদি নামাতে পারে নি। তখন তাঁরা শোক ও দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়। সকলেই তাদের জীবনের প্রতি নিরাশ হয়ে পরস্পরকে ওসীয়্যত করতে শুরু করে। এরই মধ্যে হযরত আলার আহ্বানকারী সবাইকে একত্রিত হবার ঘোষণা দেয়। সকলেই তার নিকট একত্রিত হয়। হযরত আলা বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে এ কি অস্থিরতা ও ভীতি প্রত্যক্ষ করছি! আর তোমরা এরূপ চিন্তিত কেন? লোকজন বলল, এটি তো এমন কোন বিষয় নয় যার জন্য আমাদেরকে অভিযুক্ত

করা যেতে পারে। আমাদের উটগুলো হারিয়ে গেছে বিধায় আমাদের এরূপ অবস্থা। যদি এভাবেই প্রভাত হয় তাহলে ভালোভাবে সূর্যোদয়ের পূর্বেই আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। হযরত আলা বলেন, হে লোকসকল! ভয় পেয়ো না। তোমরা কি মুসলমান নও! তোমরা কি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে আস নি? তোমরা কি আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী নও? সবাই বলল, নিঃসন্দেহে আমরা (আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী)। হযরত আলা (রা.) বলেন, তোমাদের জন্য সুসংবাদ; কেননা আল্লাহ্ তা'লা কখনো এরূপ লোকদেরকে, যে অবস্থায় তোমরা রয়েছ, কখনো পরিত্যাগ করবেন না। ফজরের সময় ফজরের আযান হয়। হযরত আলা (রা.) নামায পড়ান। কতক ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায পড়েন, পানি ছিল না, কতকের পূর্বের ওযুই ছিল। নামায শেষ হবার পর হযরত আলা দোয়া করার জন্য তার দুই হাঁটুর ওপর ভর করে বসে যান আর অন্যরাও তদ্রুপ নতজানু হয়ে দোয়ার জন্য বসে পড়ে এবং দু'হাত উঠিয়ে আহাজারি করে দোয়ায় রত হয়ে যান। লোকজনও সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত এমনই করে। যখন পূর্ব দিগন্তে সামান্য পরিমাণে সূর্যের কিরণ প্রকাশিত হয় তখন হযরত আলা সারির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন এবং তিনি বলেন, এমন কেউ কি আছে যে গিয়ে সংবাদ নিয়ে আসবে যে, এই আলোর উৎস কী? এক ব্যক্তি সেই কাজের জন্য যায়। সে ফিরে এসে বলে, এই আলো কেবলমাত্র মরীচিকা, যেখানে আলো পড়ছিল সে স্থানটি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তা পানি ছিল না বরং মরীচিকা ছিল। হযরত আলা পুনরায় দোয়ায় মগ্ন হয়ে যান। পুনরায় সেই আলো দৃষ্টিগোচর হয়। সংবাদ নিয়ে জানা যায় যে, এটি মরীচিকা। তৃতীয়বার পুনরায় আলো দেখা দেয়। এবার সংবাদ প্রদানকারী এসে বলে, এটি পানি। হযরত আলা দাঁড়িয়ে যান এবং অন্যান্য লোকজনও দাঁড়িয়ে যায় আর পানির নিকট পৌঁছে সকলেই পানি পান করেন এবং গোসল করেন। সেখানে কোন ঝরনা নির্গত হয়েছিল। তখনও পূর্ণরূপে দিনের আলো প্রকাশ পায় নি, লোকজনের উট সকল দিক হতে তাদের নিকট ছুটে আসতে দেখা যায়; তারা তাদের নিকট এসে বসে পড়ে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বাহন হাতে নেয় এবং তাদের কারো কোন সরঞ্জাম হারায় নি। দোয়ার ফলে এরূপ অলৌকিক ঘটনা সেখানে সংঘটিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা পানিও নির্গত করেছেন, উটও ফেরত এসেছে। লোকজন সেগুলোকেও পানি পান করায়। পুনরায় তারা নিজেরাও তৃপ্তির সাথে পানি পান করে এবং পশুগুলোকেও পান করায় এবং নিজেদের সঙ্গে পানির ভাণ্ডারও নিয়ে নেয় এবং পূর্ণরূপে বিশ্রাম করে।

মিনজাব বিন রাশেদ বলেন, সে সময় হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) আমার সাথে ছিলেন। যখন আমরা সেই স্থান হতে কিছুটা দূরে চলে আসি তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, সেই পানির স্থান সম্পর্কে অবগত আছো? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি এই অঞ্চলের প্রতি ইঞ্চি ভূমিকে অন্য সকল আরবের তুলনায় অধিক জানি। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বলেন, তাহলে তুমি আমাকে সেই জায়গায় নিয়ে চল। আমি উট ঘুরিয়ে হুবহু সেই ঝরনার স্থানে নিয়ে আসি। সেখানে গিয়ে দেখি যে, সেখানে না কোন জলাধার আছে, না পানির কোন চিহ্ন আছে। আমি হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.)-কে বলি, খোদার কসম! যদিও এখানে কোন চৌবাচ্চা আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না তথাপি আমি এটিই বলব যে, এটিই সেই স্থান যেখান হতে আমি পানি নিয়েছি; কিন্তু আজকের পূর্বে আমি কখনো এখানে পরিষ্কার ও মিষ্টি পানি দেখি নি। অথচ তখনও পানিতে পাত্র পরিপূর্ণ ছিল। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বলেন, হে **আবু সাহাম!** খোদার কসম! এটিই সেই স্থান; এজন্যই আমি এখানে এসেছি এবং তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমি আমার পাত্র পানি দ্বারা পূর্ণ করেছিলাম এবং সেটিকে

এই জলাধারের কিনারায় রেখে দিয়েছিলাম। আমি বললাম, যদি এটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অলৌকিক নিদর্শন ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অনুগ্রহ হয়ে থাকে তাহলে আমি এটি বুঝতে পারব আর যদি এটি শুধুমাত্র বৃষ্টির পানি হয়ে থাকে তাহলে সেটিও বুঝতে পারব। দেখার পর বুঝা গেল, নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ্ তা'লার একটি অলৌকিক নিদর্শন ছিল যা তিনি আমাদের রক্ষার্থে প্রকাশ করেছিলেন। এতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আল্লাহ্‌র প্রশংসাকীর্তন করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে আমরা যাত্রা অব্যাহত রাখি এবং হাযর-এ এসে যাত্রা বিরতি দিই।

হযরত আলা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে এই মর্মে একটি চিঠি লিখেছিলেন যে, পর সমাচার! আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য **দাহ্‌না উপত্যকায়** পানির একটি ঝরনাধারা প্রস্ফুটিত করেছিলেন; এই ঘটনার পর যখন হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি এই চিঠি লিখেন; অথচ সেখানে ঝরনার কোন চিহ্নও ছিল না এবং চরম কষ্ট ও দুশ্চিন্তার পর আমাদেরকে তাঁর একটি নিদর্শন দেখিয়েছেন; হযরত আলা হযরত আবু বকর (রা.)-কে চিঠি লিখেন; যা আমাদের সকলের জন্য শিক্ষণীয় এবং এটি এজন্য যে, তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করুন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করুন এবং তাঁর ধর্মের সাহায্যকারীদের জন্য সাহায্য যাচনা করুন। হযরত আলা পানি পাবার পর (অর্থাৎ) এ ঘটনা সংঘটিত হবার পর হযরত আবু বকর (রা.)-কে রিপোর্ট প্রেরণ করছেন। হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসাকীর্তন করেন, তাঁর নিকট দোয়া করেন এবং বলেন, আরবরা সর্বদা এই দাহ্‌না উপত্যকা সম্পর্কে একথা বলে আসছে যে, হযরত লুকমানকে যখন এই উপত্যকা (অর্থাৎ, দাহ্‌না উপত্যকা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, পানির জন্য এটিকে খনন করা উচিত হবে কি না, তখন তিনি তা খনন করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, এখানে কখনো পানি নির্গত হবে না। এ কারণে সে সময় এই উপত্যকায় ঝরনা প্রস্ফুটিত হওয়া আল্লাহ্ তা'লার কুদরত বা শক্তির অনেক বড় একটি নিদর্শন যার বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে আমরা কখনো কোন জাতিতে শুনি নি। অতএব এ ধরনের অলৌকিক ঘটনাও সাহাবীদের সাথে সংঘটিত হতো যারা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে বিভিন্ন অভিযানে বের হতেন। যাহোক, এর বাকি অংশ আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লণ্ডন কর্তৃক অনূদিত)